টরন্টোর চিঠি

দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

কানাডা—মাল্টিকালচারাল দেশ	৭
ছবির মত সাজানো পাহাড় আর লেক	১২
গাছ আমার প্রাণ	১৭
ইমিগ্রেশন	২৩
বাঙালির প্রাণের শহর	২৮
প্রবাসীর পত্তন	৩৪
হোটেলে একরাত সাড়ে তিনশো ডলার	৩৯
বিমান বসু—ভদ্রলোক ঠিক কমিউনিস্ট নন	৪২
খাই খাই করছে আমার পাগলা মন	৪৯
শমিত	৫৩
পুঁইশাক খেতে হাজার টাকা	৫৮
আমেরিকার কালোরা পুরো আমেরিকান	৬৩
ডিলা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস, ইয়াক ইয়াক	৬৬
বড়ো একটা রুইমাছ চল্লিশ ডলার	৭০
বাড়ি ভাড়া দেওয়া ভালো ব্যাবসা	৭৫
চালাও পানসি বেলঘরিয়া	৭৯
মেপলে ভর্তি কানাডা, আমেরিকা	৮৪
দুষ্ট লোকে মদ খায়/আমি থাকি ভদ্‌কায়	৮৯
ভগবান ভালো জায়গায় থাকেন	৯৪
হাইওয়ের নাম চারশো দিয়ে	৯৯
নায়াগ্রা ফল্‌স—এক আশ্চর্য সুন্দর জলপ্রপাত	১০২

কানাডা—মাল্টিকালচারাল দেশ

কানাডা দেশটার মূল কথা হল মাল্টিকালচারিজম অর্থাৎ বহুজাতির সমন্বয়ে এই দেশটা গড়ে উঠেছে। তাই সরকার নানা দেশের মানুষ যারা এখানে ঘর বেঁধেছেন তাদের সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্য নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন সবসময়। তবে এর জন্য প্রচুর অপচয়ও হয়ে থাকে। আমাদের শহরের প্রতিটা পুরসভার অধীনে অনেক লাইব্রেরি আছে। এক একটা লাইব্রেরি বিশাল আকারের এবং এইখানে পুরসভা নানা ভাষীর জন্য নানা ভাষার বই রেখেছেন। বাংলা বই, ওড়িয়া বই, হিন্দি বই থেকে পৃথিবীর সব জাতির বই আপনি কিছু না কিছু পাবেন। কারণ সরকার চান যাতে আমরা আমাদের ভাষা ভুলে না যাই এবং আমাদের সংস্কৃতি বজায় রাখি। কানাডাকে বলা হয় মোজেইকের দেশ অর্থাৎ মোজেইকের কুচির মতো নাগরিকেরা তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। আবার আমেরিকাকে বলা হয় মেল্টিং পট। অর্থাৎ সারা বিশ্বের মানুষ এখানে ঘর বাঁধতে এসে গলে গিয়ে আমেরিকান বনে যায়। কথাটা সত্যি নয় বলে আমি মনে করি। এই নিয়ে আমার সঙ্গে বিতর্কও হয়েছিল গুণীদের সঙ্গে একদিন খবরের কাগজের অফিসে, আমার যুক্তিকে ওরা মেনে নিয়েছিল যে আমি ঠিক। দুটো দেশই মোজেইক আবার দুটো দেশই মেল্টিং পট। আমরা যখন এদেশে প্রথম আসি, আমরা একেবারেই পালটাই না। সেই ভাত মাছ খাওয়া, সেই পুজোবাড়িতে

যাওয়া, সেই ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা—কিছুই পালটায় না। আমরা সম্পূর্ণ ভারতীয় বা চাইনিজ বা কোরিয়ান থেকে যাই মৃত্যুর আগের দিন অবধি। অবশ্য বহু চিড়িয়া আপনারা দেখেছেন দেশে যারা টাই পরে মাছের দোকানে যায় এবং বাংলা ভুলে গেছে ভাব দেখায়। তারা নাকি বাঙালিদের সঙ্গে মেশে না। ইল্লিমারি ফুটকড়াই ছড়িয়ে দিলে গড়গড়াই। এখানে ওরকম বহু চিড়িয়া আছে। দুঃখ হয় বেচারাদের জন্য। বলে ভাত মাছ খায় না। কিন্তু চাঁদু, ছিলে তো যাদবপুরের কলোনিতে। হাতুড়ি পেটাতে গিয়েছিলে জার্মানিতে যাট সালে, এখন লবচপানির সীমা নেই। সব সময় ইয়া ইয়া করছে। ইয়েস বল। আমার সামনে সহজে কেউ মুখ খোলে না। আমার বাড়িতে এসে মোচার ঘণ্ট, এঁচোড় খেয়ে তার মায়ের হাতে রান্নার কথা মনে পড়ে নাকি। খায় আর ও ইয়া ও ইয়া করে। যা বলছিলাম, আমেরিকাতেও এই একই অবস্থা। নানা দেশের মানুষ তাদের সংস্কৃতি বজায় রাখতে পেরেছে প্রথমে যারা এসেছেন। অবশ্য ইটালিয়ান, পোর্তুগিজ, মেক্সিকান, স্প্যানিশরা ওদের সব কিছুই অটুট রেখেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ওদের সংস্কৃতি পাল্টায়নি বা ভোলেনি। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। আমাদের ছেলেমেয়েরা এইবার মেল্টিং পটে গলে যাচ্ছে। আমার ছেলেদেরই উদাহরণ দিই। আমি দেশ ছেড়েছিলাম খুব কম বয়সে, ধরুন বাইশ বছর বয়সে। আমি একটা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার থেকে এসেছি। আমার বিদ্যে খুব কম। ডিগ্রি যেটা আছে তার বাজারের কোনো মূল্য নেই। কাজের রাস্তার বুদ্ধি দিয়েই আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে এ দেশে। সে অনেক ইতিহাস শুনিয়ে আপনাদের বিরক্তির কারণ হতে চাই না। আমার স্ত্রী বাঙালি। ভাগ্যিস বাঙালি, নইলে ইংরেজিতে প্রেম করতে হত। অবশ্য এখন প্রেমটেম উধাও হয়ে গেছে, সকালবিকেল বঁটিতে ধার দিচ্ছেন। আমার চালচলন পছন্দ নয়, কারও দিকে তাকাতে পারব না, আর কদিন! আজকাল উনি রেকর্ড নন শুধু, সিডি প্লেয়ার—বকবকানি আরম্ভ হলে কিছুতেই থামে না। তবে হ্যাঁ, সংসারে আমি মুক্ত মানুষ। কুটোগাছটা আমায় নাড়তে হয় না। সবই তিনি দেখেন। বউয়ের মতো বউ, সকাল থেকে ঘরবাড়ি পরিষ্কার হচ্ছে। আটটার জলখাবার, বিকেলের জলখাবার, রাত্রিতে খাবার সব টাইম বেঁধে। ডালের হাতায় পালং তুলতে পারবেন না। ভাতের হাতায় ডাল তুলতে গেলে সিডি বাজবে ঘণ্টা খানেক। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দুই ছেলের জন্ম এখানে, তাও আবার বাঙালি ডাক্তারনির হাতে। ডালিয়া রায়, আমাদের খুব ভালো বন্ধু। ছেলেরা কানাডিয়ান। আমি জানি কিছুতেই ওদের বাঙালি করে রাখতে পারব

না। কৃষ্ণেন্দু নির্ভুল বাংলা বলে। কিন্তু লিখতে বা পড়তে পারে না। স্বর্ণেন্দু সাহেব, সে বাংলা বলবে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে। বলবে আমি চানিং। অর্থাৎ চান করছি। এখানে সরকার সব দেশিদের জন্য ডলার খরচা করে নিজেদের ভাষা শেখাতে উৎসাহ দেয়। শনিবারে কোনো কোনো স্কুলে বাংলা, তেলুগু, চিনা ভাষার দিদিমণিরা আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন স্বর্ণেন্দুর মতো ছেলেমেয়েদের নিজেদের ভাষা শেখাতে। আমরা ওদের নিয়ে গেছি বাংলা স্কুলে কিন্তু নব্বুই ভাগ লোকই নিয়ে যায় না। অবশ্য নিয়ে গেলেও যে খুব কাজ হত তাও আমি বিশ্বাস করি না। কারণ ওরা ভুলে যাবে। সবাই ভোলে না। কৃষ্ণেন্দু ভুলবে না, কারণ আমরা বাড়িতে বাংলা বলি, বাঙালি খাদ্য খাই, পুজোতে নিয়ে যাই। দেশে নিয়ে ফুচকা খাওয়াই, রোল খাওয়াই; কিন্তু স্বর্ণেন্দুকে নিয়ে খুব মুশকিল। কেন ইন্ডিয়াতে যেতে হোবে? আমার ভালো লাগে না। ওখানে লিজার্ড খুব বেড়ায় (টিকটিকি) ঘরের মড্য। মোশাতে আমাকে র‍্যাশ করে দিয়েছে, মনে নেই? টিকটিকি, মশা, আরশোলা না থাকলে পরিবেশ ঠিক থাকবে কী করে? কলকাতায় যদি কাকই না থাকবে তবে অত জঞ্জালের কী হবে? ইনি বাড়িতে সহজে ভাত ডাল খাবেন না। কাজেই স্পিগেতি আর পিৎসা, নয় মুরগি ভাজা, খুব চ্যাঁচামেচি করলে বলে ও. কে, ও. কে আমাকে মাখন ভাট আর আলুভাজা ডিটে পার। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই এ রকমের। বাংলা অনেকেই বলে কিন্তু খুব কষ্ট করে বলে। এর ব্যতিক্রমও আছে বেশ কিছু। যারা শুধু বাংলা বলেই না, তারা অপূর্ব গান গায় বাংলায়। মণিদীপা ভট্টাচার্য অসম্ভব ভালো গান গায়। ইংরেজি বা এদেশের গানে একদিন ও নাম করবে। ওর মা মঞ্জুষাও খুব ভালো গাইয়ে। ওর স্বামী দিলীপ ভট্টাচার্য ইঞ্জিনিয়ার। সদাই চিন্তিত, পাছে কেউ ক্ষতি করে দেয়। মানুষটা ভালো, বাড়িতে গেলে মন খুলে খাওয়ায়। ওদের বাড়িতে অজয় চক্রবর্তী প্রায়ই আসেন। তখন আমাদের সারারাত চলে গানের উৎসব। অজয় চমৎকার মানুষ, খেতেও ভালোবাসে আমার মতো। আর আছে সাসা ঘোষাল, বনানী, আর্য্য মুখার্জি তবলায়। সাসা কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীতে নাম করে এসেছে। আজালিয়া রায় তো রীতিমতো খুব উঁচুতলার গায়িকা। এরা সবাই এখনকার ছেলেমেয়ে। গানের স্কুল আছে বেশ কয়েকটা। শান্তি চক্রবর্তী গান শেখান বহু বছর ধরে। শান্তিদি আমাদের খুব প্রিয়। উনি ভারতে বহুদিন রেডিয়োতে গান করেছেন, শিখিয়েছেন। ভারতের তাবড় তাবড় গুণীরা শান্তিদির সঙ্গে এসে বসেন, রেওয়াজ করেন। তারপর আছে মানসী অধিকারী, গৌরী গুহ,

যারা খুবই ভালো গান তো করেনই, এরা বহু যত্ন নিয়ে বাচ্চা বুড়ো সবাইকে গান শেখান। এখন মুশকিল হয়েছে যে আমার বহু বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে এখন দামি দামি পাকরাসী হারমোনিয়াম এসে গেছে। ওরা গান ভালোই করেন, চর্চা করেন, কিন্তু আমি পাগল হয়ে যাই এদের বাড়িতে নেমন্তন্ন হলে। নেমন্তন্নগুলো সাধারণত শনিবার হয়ে থাকে। আমরা যাই সারা সপ্তাহের খাটুনি সেরে একটু আড্ডা মারতে পি এন পি সি করতে। আপনারা নিশ্চয় জানেন পরনিন্দা পরচর্চা করতে না পারলে আমাদের পেটের ভাত হজম হয় না। গর্ভযন্ত্রণা হয় তখনই যখন গৃহকর্ত্রী তার হারমোনিয়াম নিয়ে গান শোনাবেনই। রবি ঠাকুরের গান—তুমি এসেছিলে তবু আসো নাই জানায়ে গেলে। আমি বুঝি না বাপু—তুমি যখন এসেছিলেই তবে কলিংবেল বাজাওনি কেন? দরজা ধাক্কাওনি কেন? আপনারা খুব রেগে যাবেন আমার কথা শুনে। রবি ঠাকুর কিন্তু আমাদের চরিত্র খুব নরম করে দিয়েছেন। হাজার হাজার ছেলে, বুকের ছাতি আটাশ নিয়ে গলায় পাউডার লাগিয়ে তোমার হল শুরু আমার হল সারা, করে করে কেঁদে বেড়াচ্ছেন। রবি ঠাকুরের বিপ্লবের কি কোনো গান নেই। নজরুলের আগুন লাগানো গান, আই পি টি আই এর গান, বিপ্লবী গান আর কেউ সহজে গায় না। তারপর এরা আবার আজকাল দেশ থেকে বহু টাকা খরচা করে সিডি বানিয়ে এনেছেন। তার একটা কেনা দরকার। বোঝো ঠ্যালা। আমি গান শুনতে ভালোবাসি। বাইরের বরফ পড়বে, জানলায় দাঁড়িয়ে হাতে একটা স্কচ নিয়ে সুচিত্রাদির বা দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনব, আহা তার মেজাজই আলাদা। লোকের বাড়িতে পার্টিতে গিয়ে মুখ বুঁজে আহা আহা করে মাথা নাড়াতে আমি নারাজ। ওর থেকে আমাদের গানের পার্টি পীযূষের বাড়িতে অনেক ভালো হল। পীযূষ মিত্র, বুলবুল মিত্র গড়িয়াহাটায় বাড়ি। ওর বাড়িতে প্রায়ই আসর বসে। এই পার্টিতে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। খিস্তি খেউর, জোকে আমরা নির্ভেজাল স্ফূর্তি করি। প্রাণ খুলে হাসার জায়গা কখনও আঁতেলদের আসরে হয় না। ভাদু ব্যানার্জির পল্লিগীতি, রাম ব্যানার্জির নানা ধরনের আধুনিক গান, বুলবুলের রবীন্দ্রসংগীত বা ভজন, সেই সঙ্গে বাজনা। হই হই কাণ্ড। খাবার আসছে, পানীয় আসছে—সে এক অন্যরকমের আসর। সেখানে অবশ্যই কোনো সিরিয়াস ব্যাপার নেই বা গানের সমঝদারির দরকারও নেই আমাদের। হ্যাঁ যা বলছিলাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে বা আমেরিকাতে বা ব্রিটেনে সবাই গলে গিয়ে তাদের দেশের নাগরিকে পরিণত হয়। আজ মি. বোস একজন বিখ্যাত

বাঙালি আমেরিকার; কিন্তু, তাঁর বর্তমান প্রজন্মরা প্রায় পুরোপুরি আমেরিকান। কত চকাবুটি, ম্যান্ডল, গোসরা একসময়ে পুরো বাঙালির ঘর থেকে এসেছিলেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এই দেখুন না আমেরিকার নামকরা দুই সেনেটরো ডোল আর ম্যান্ডেল ওরা কারা? একজন ঢোল আর-একজন মণ্ডল। হতেই হবে। যেসব ছেলেমেয়ে—যারা বাংলা বলতে পারেন বা বলবেন, যতদিন ওরা কোনো বাঙালির সঙ্গে মিশতে পারবেন। তারপর কী হবে? আমাদের ছেলেরা বাঙালি বিয়ে করবে না তার কারণ হচ্ছে বাঙালি মেয়ে পাওয়া যাবে না তা নয়, কিন্তু সে বাঙালি মেয়েরাও টুমি কেমন আছ বা আমি চানিং বাঙালি। তা ছাড়া আমাদের ছেলেমেয়েরা মিলেমিশে শুয়ে তবেই বিয়ে করবে। অনেক বন্ধুবান্ধবদের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করেছে বটে বাঙালি কিন্তু আসলে ওরা সব সাহেব। বাংলায় কথা বলে না বা বাংলা খাবার খায় না। সব থেকে আঘাত পেয়েছেন বেশ কয়েকজন মানুষ যাদের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করেছে মুসলিম ছেলেকে। অথচ সেই মুসলমান ছেলেটি আর একটি কানাডিয়ান। তার কোনো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, সে শিক্ষিত, মার্জিত আমাদের সবার মতো, তবু ভট্টাচার্যের মেয়ে যদি মুসলমান বিয়ে করে তবে কলকাতায় তাদের মুখ দেখানো মুশকিল হয় বই-কি। আমার ছেলেরা একদিন আমাকে বর্ণবিদ্বেষী বলে রীতিমতো আলোড়ন তুলল; কারণ আমি ওদের প্রায়ই বলি দেখ যখন বিয়ে করবি দেখবি যেন ভারতীয় হয়, কালো এড়িয়ে চলিস। সত্যি কথা বলতে কি এটা বর্ণবিদ্বেষ না হলেও জাতিবিদ্বেষ। আমার বক্তব্য তা নয়। আমার বিশ্বাস যদি নিজেদের কালচারে বিয়ে না হয় তবে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।